অবকাশ

কেমন লাগছে 'অবকাশ'? জানান আপনাদের মতামত। থাকে যদি কিছু পরামর্শ, তাও জানান। সানন্দে গ্রহণ করব আমরা।
কারণ আপনারা ভালোবাসলে তবেই আমাদের পথচলা সার্থক।
আরও কিছু জানতে বা জানাতে এবং লেখা পাঠাতে -
মোবাইল ৯৫৬৪০৬৫৫৫৫ অথবা ই-মেল lipiarambagh@gmail.com
যে ঠিকানায় লেখা পাঠাবেন - দেবাংশু চক্রবর্তী, আর্থিক লিপি, ওয়ার্ড নং ৪, কোর্ট পাড়া, পোঃ-আরামবাগ, জেলা - হুগলি, পিন-৭১২৬০১

১ মে মান্না দে-র জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিশেষ রচনা

উত্তমের ঠোঁটে হেমন্তের চেয়ে মান্নার গানসংখ্যা বেশি ও জনপ্রিয়ও

বিভাংশু দত্ত

একটা প্রচলিত ধারণা আছে, উত্তমকুমারের ঠোঁটে হেমন্তের গান সবচেয়ে বেশি মানানসই। উত্তম ও হেমন্ত যেন সমার্থ। উত্তম-হেমন্ত যেন মণিকাঞ্চন। উত্তমের লিপে হেমন্তের গানই সবচেয়ে বেশি এবং সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়ও।

মোহগ্রস্ত গড়পড়তা বাঙালির এটাই সাধারণ অভিমত। এর পিছনে যতটা সংস্কার কাজ করে যুক্তি-তথ্য ততটা জায়গা করে নিতে পারে না। যুক্তি তথ্য পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাব এই অভিমত সংগত নয়।

অবশ্য এটা স্বীকার করতেই হবে ১৯৬৬তে 'শঙ্খবেলা'-র আগে উত্তমের লিপে হেমন্তের গানই বেশি মানাত এবং উত্তম-হেমন্তের যুগ্ম মিলনে অনেক জনপ্রিয় গানও সৃষ্টি হয়েছে, যে গানগুলো আজও আমাদের সোনালি অতীতের গর্ব। তবে 'শঙ্খবেলা'য় মহানায়কের ঠোঁটে মান্না দে-র গাওয়া 'আমি আগন্তুক, আমি বার্তা দিলাম' আর 'কে প্রথম কাছে এসেছি' (লতার সঙ্গে দ্বৈতকণ্ঠে) গান দুটোর আগে উত্তমের লিপে হেমন্তের গানই সংখ্যাই বেশি ছিল, জনপ্রিয়ও ছিল তো বটেই। 'শাপমোচন', 'সপ্তপদী', 'হারানো সুর', 'ইন্দ্রাণী' প্রভৃতি ছবির জনপ্রিয় গানগুলো তার উদাহরণ। এমনকী 'শঙ্খবেলা'র আগে শ্যামল মিত্রের গাওয়া উত্তমের লিপে 'সাগরিকা' ছবির 'আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা থাকে' গানও যথেষ্ট জনাদৃত।

১৯৬৬-র 'শঙ্খবেলা'ই উত্তম-হেমন্তের মিথ ভেঙে দেয়। এল নতুন যুগ, নতুন বাঁক। উত্তম-মান্নার যুগলবন্দিতে একে একে সৃষ্টি হতে লাগল সব কালজয়ী গান। ১৯৬৬ তেই উত্তমকুমারের তিনটে ছবিতে তিনজন ভিন্ন ভিন্ন গায়ক ছিলেন। ১৯৬৬ র মার্চে মুক্তিপ্রাপ্ত 'রাজদ্রোহী' ছবিতে উত্তমের লিপে শ্যামল মিত্রের গান 'কোথাও আমার নেই সময় থামার', এপ্রিলে মুক্তি পেল পরিচালক উত্তমের প্রথম ছবি 'শুধু একটি বছর'। পরিচালক অভিনেতা উত্তমের এই ছবিতে হেমন্তের গান ছিল 'স্বপ্নজাগানো রাত'। আর ২০ অক্টোবরে মুক্তিপ্রাপ্ত 'শঙ্খবেলা'র ছবির গানের কথা তো আগেই বলেছি।' রাজদ্রোহী', 'শুধু একটি বছর'-ছবির গানের চেয়েও সুধীন দাশগুপ্তর সুরে 'শঙ্খবেলা'র ছবির গান জনপ্রিয়তায় অনেকখানি এগিয়ে ছিল। এই 'শঙ্খবেলা' ছবির গানের প্রসঙ্গে মান্না দে তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন 'সুধীনবাবুই প্রথম আমায় দিয়ে গাইয়েছিলেন 'শঙ্খবেলা' ছবিতে উত্তমকুমারের লিপে 'কে প্রথম কাছে এসেছি' আর 'আমি আগন্তুক, আমি বার্তা দিলাম'। আমার বহুদিনের মনোগত বাসনার সার্থক ইচ্ছাপূরণ হয়ে গেল। আমার বহুদিনের ইচ্ছে ছিল যে উত্তমবাবুর লিপে গাইতে হবে, কারণ আমি এটা জানতাম যে বাংলা চলচ্চিত্র জগতে মহানায়কের লিপে ভালোভাবে গাইতে পারলেই, আমার বাংলা সংগীতজগতে সশব্দ পদার্পণ সম্ভব।' ('জীবনের জলসাঘরে' পৃ- ১৭১-১৭২)

'শঙ্খবেলা' থেকে শুরু হল উত্তম মান্নার নতুন যুগ। পরের বছরেই মুক্তি পেল গানে ভরা উত্তম তনুজার ছবি 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি'। অনিল বাগচির সুরে এ ছবির মান্নার গাওয়া প্রায় সবকটা গানই হিট। তার মধ্যে 'আমি যে জলসাঘরে', 'আমি যামিনী, তুমি শশী হে' আর দ্বৈতকণ্ঠে 'চম্পাচামেলী গোলাপেরই বাগে' গান আজকের দিনেও সমান জনপ্রিয়। সেই বছরেরই ছবি 'জীবন মৃত্যু'। সন্ধ্যার সঙ্গে মান্না গাইলেন 'কোনো কথা না বলে'। পর্দায় লিপ দিয়েছিলেন উত্তম ও সুপ্রিয়া। ঠিক পরের বছরই তিন তিনটে উত্তম চিত্রে মান্না দে গান গেয়েছেন। তার মধ্যে 'চৌরঙ্গী' ছবিতে অসীমা ভট্টাচার্যের (মুখোপাধ্যায়) সুরে মহানায়কের লিপে মান্না দে-র সেই গান 'বড় একা লাগে এই আঁধারে' আজও কোনো এক মন খারাপ-করা-বিকেলে সত্যিই আমাদের মন খারাপ করে দেয়। ১৯৬৯-এ আরেক সংগীতবহুল মহানায়কচিত্র 'চিরদিনের'। নচিকেতা ঘোষের সুরে উত্তমের লিপে মান্না দে গেয়েছিলেন চারটে গান। গানগুলো হল 'মানুষ খুন হলে পরে', 'ফুল পাখি বন্ধু আমার ছিল', 'লাল নীল সবুজেরই মেলা বসেছে'। আর সন্ধ্যার সঙ্গে দ্বৈতকণ্ঠে 'তুমি আমার চিরদিনের'। দুর্দান্ত হিট এই চারটে গান। একই বছরে উত্তমের 'সবরমতী' ছবিতে গোপেন মল্লিকের সুরে এই ছবিতে মান্না দে গাইলেন 'দেখনি পাথরেও ফোটে'। গানটা অবশ্য জনপ্রিয় হয়নি।

পরের বছর ১৯৭০ এ নচিকেতা ঘোষের সুরে বিভূতিকাহিনি নিশিপদ্ম' ছবিতে মান্নার গাওয়া উত্তমলিপের দুটো গানই দারুণ জনপ্রিয় ' নানা না আজ রাতে আর যাত্রা শুনতে যাব না' আর 'যা খুশি ওরা বলে বলুক।' আজও আমাদের সুখস্মৃতি আচ্ছন্ন করে রাখে। পরের বছরে 'ছদ্মবেশী' ছবিতে উত্তমলিপে আবার মান্না দে-র গাওয়া চিরজনপ্রিয় দুটো গান। সুধীন দাশগুপ্তর সুরে 'আমি কোন পথে যে চলি' আর 'বাঁচাও কে আছ মরেছি যে প্রেম করে' গাওয়ার প্রায় পঞ্চাশ বছর পরেও গান দুটি একই রকম জনপ্রিয়। ১৯৭২ এ পবিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সুরে 'আলো আমার আলো' ছবিতে উত্তম ওষ্ঠে মান্নাগীতি 'এই এত আলো এত আকাশ' সহজে কি ভোলা যায়? কোনটা ছেড়ে কোনটা রাখি? ১৯৭৪ এর 'মৌচাক'-এর গানগুলোর কথা একবার ভাবা যাক। নকল মাতালের অভিনয় করতে করতে ভাই রঞ্জিত মল্লিককে নিয়ে উত্তম গাইছেন 'তা বলে কি প্রেম দেব না' বা 'এবার মলে সুতো হব'। আবার মেয়েদের কাছে কবির লড়াইয়ে হেরে যাচ্ছে দেখে ভাইকে বাঁচাতে উত্তম গাইছেন 'পাগলা গারদ কোথায় আছে নেই বুঝি তা জানা'। নচিকেতা ঘোষের সুরে মান্না দে-র গাওয়া তিনটে গানই সমান জনপ্রিয়। এর মধ্যে ১৯৭২ এ সুধীন দাশগুপ্তর সুরে উত্তম সুচিত্রার জুটির 'হারমানা হার' ছবিতে মহানায়কের লিপে মান্না দে যে-কয়েকটা গান গেয়েছিলেন সে সময় শ্রোতাদের মনে সে গানগুলোর রেশ থেকে গিয়েছিল বেশ কিছুদিন। ১৯৭৫ এ উত্তম চিত্র 'বাঘবন্দী খেলা' ছবিতেও মান্নার 'টুকরো হাসির তোল ফোয়ারা' গানটাও কম হিট হয়নি।

১৯৭৫-এ গানে ভরা ছবি 'সন্ন্যাসী রাজা'। এ ছবিতে নচিকেতা ঘোষের সুরে উত্তমের জন্য মান্না দে দশটা গান গেয়েছিলেন। এ ছবির গান 'কাহারবা নয়, দাদরা বাজাও' আজও আমাদের গলা ছেড়ে গাইতে ইচ্ছে করে। ১৯৭৬ এও নচিকেতা ঘোষের সুরে 'আনন্দমেলা' ছবিতে তোতলা উত্তমের লিপে মান্না দে গেয়েছিলেন 'আমি উকিল না হয়ে', মজার ছবি। গানটাও মজার। ১৯৭৬এ আবার উত্তমের ছবি, আবার মান্না দে, আবার সুরকার সেই নচিকেতা ঘোষ। 'হোটেল স্নো ফক্স' ছবিতে অনেক গান ছিল। তবে শ্রোতারা বেশিদিন ধরে রাখতে পারেনি সে-সব গান। এরপর উত্তমচিত্র 'সেই চোখ', 'ভোলা ময়রা'-তেও গান গেয়েছিলেন মান্না দে। তবে সে সব গানের কথা জনপ্রিয়তার নিরিখে উল্লখ না করাই ভালো। দর্শক ছবিগুলি দেখেছে আর ভুলতে বেশি সময় নেয়নি। 'ব্রজবুলি'-র ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। মহানায়কের জীবন সায়াহ্নের এই ছবিতে নচিকেতা ঘোষের সুরে মান্না দে আটটা গান গেয়েছিলেন। গানগুলোর একটাও মনে রাখার মতো নয়। অবশ্য সে বছরেই 'দেবদাস' এ উত্তমলিপে মান্নার গাওয়া দুটো নজরুল গীতিই সুপার হিট। 'শাওন রাতে যদি', আর 'যেদিন লব বিদায়' বাঙালি শ্রোতা কোনওদিনই ভুলবে না। বিশেষ করে প্রথম গানটা তো বটেই। এই হল মান্না দে-র গাওয়া উত্তম লিপের গানের দীর্ঘ তালিকা। ১৯৬৬ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত পনেরো বছরের দীর্ঘ পথ পরিক্রমা। এর মধ্যে অবশ্য উত্তমকুমার কয়েকবার মান্না ছাড়া অন্য গায়কের গলাতেও ঠোঁট মিলিয়েছেন। ১৯৬৯ এ 'মন নিয়ে' ছবিতে উত্তমলিপে হেমন্ত গেয়েছিলেন সেই বিখ্যাত গান 'ওগো কাজল নয়না হরিণী'। ১৯৭৩ এ 'বনপলাশীর পদাবলী'তে উত্তমের লিপে সবকটা হিট গানই গেয়েছিলেন শ্যামল মিত্র। ১৯৭৫ এ 'আমি সেও সখা' ছবিতেও উত্তমের লিপে শ্যামলের গান। আর ৭৪ এর 'অমানুষ' আর ৭৭-এর 'আনন্দ আশ্রম' ছবিতে উত্তমের ঠোঁটে কিশোর কুমারের গাওয়া সেই চিরস্মরণীয় গানগুলোর কথা তো সবারই জানা। এ কয়েকটা গান বাদ দিলে উত্তমের লিপে সংখ্যায় এবং জনপ্রিয়তায় সবচেয়ে বেশি গান গেয়েছেন এক ও অদ্বিতীয় মান্না দে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় অনেকটাই পিছনে।

এক আঁজলা হিজিবিজি স্মৃতি

হিন্দোলা মজুমদার

জানলার গ্রিল ধরে চুপচাপ একমনে বসে আছি। সূর্যের গনগনে আঁচটা প্রায় নিভে এসেছে। এক কাপ চায়ে চুমুক দিতে দিতে আজ বহুবছর আগের পেরিয়ে আসা কিছু নির্ভেজাল কথা, আলাপচারিতার লেনদেনগুলো ভীষণরকমভাবে ধরা পড়ছে। বাইরে কোথাও দূর থেকে আবছা ভেসে আসছে পুরোনো দিনের গান— 'আনেওয়ালা কাল জানে ওয়ালা হ্যায়'। নিজের অজান্তেই নিজের গভীরে চেনা জানা স্মৃতির লু বইছে উথালপাথাল।

আগামী সময়টাও পার হয়ে যাবে হঠাৎ করে না জানিয়ে। বহু পূর্বের পর হয়ে যাওয়া সময়গুলোও একইরকমভাবে একদিন নিরুদ্দেশ হয়েছিল, এর মধ্যে হয়তো কোনও নতুনত্ব নেই কিন্তু অন্যরকম ভালোলাগা, বিস্ময়, সান্ত্বনা সবকিছুই এলোমেলো নির্বাধ জড়াজড়ি করে ভিতরপথে যাতায়াত অব্যাহত রেখেছে আজও।

সেই শিশুবয়স থেকে আজকের 'আমি'র এই অনন্ত গতিশীল সত্তায় কোনও বিশেষ ব্যক্তি/ব্যক্তিদের নামোচ্চারণ করতে চাই না বা পারবো না। যে বা যারা আমার জীবনের কোনও অংশে এতটুকুও ইতিবাচক স্মৃতির অবদান রেখেছে (ব্যতিক্রম আমার মা-বাবা এবং আরও দুজন প্রিয় মানুষ), এমন কোনও স্মৃতি, যাকে বিশ্বাসের বশে আঁকড়ে ধরা যায়, ভরসা নিরাপত্তা মেলে যার আজন্ম কুঠুরি হতে, তেমন কোনও স্মৃতি নেই আমার, এটাই আজকের 'আমি'র অকপট স্বীকারোক্তি।

জীবনের এই ক্ষুদ্র পরিসরে শুধু যেসব জড় অজড় উপাদান প্রাত্যহিক এবং প্রত্যক্ষভাবে আমার সাথে যুক্ত ছিল, আমি আজও অহরহ তাদের মাঝেই পুরোনো অভ্যাসমতো প্রাণ খুঁজে পাই। ওরাই আমার বেলা অবেলার একমাত্র সঙ্গীসাথী।

বিদ্যালয় জীবনের টুকরো টুকরো দু-চারটে ভালোলাগা, ভাল থাকারা আধো আধো ইশারায় ডাক দিয়ে যায় এমনই কোনও পড়ন্ত বিকেলে। ফুটফুটে সেসব স্মৃতিগুলো ফিরেবার আজ মিষ্টি কষ্টের মুখে টিপটিপ বুলির মতোন এধার সেধার খেয়ালখুশি করে পড়ছে অবিশ্রান্ত।

আমার বিদ্যালয়ে প্রবেশের চওড়া ইট বাঁধানো লাল একটা রাস্তা। শেষ মুখে ডানদিকে রাস্তাসংলগ্ন একটা বাহারি জিনিসের দোকান—খাতা, পেন, পেনসিল, নানা আকারের সেই সুগন্ধী রাবার, আমার ভীষণ ভীষণ পছন্দের টম অ্যান্ড জেরি, মিকিমাউস, সিন্ড্রেলা, স্নো-হোয়াইট, বার্বি আঁকা স্টিকারগুলো আর... ঠোঙায় মোড়ানো হজমিগুলি।

সেই প্রথম দিনের পাগলামি...যেদিন স্কুলব্যাগের বইয়ের পকেটে চারটে ৫০ পয়সা মিলিয়ে দু-টাকার খুশির ঝিলিক উপচে পড়েছিল চোখে মুখে। ভারি ভারি বইয়ের তাত্ত্বিক বোঝার অতিরিক্ত কিছু যেন ক্ষণে ক্ষণে সময়ের ফাঁকে উঁকিঝুঁকি মেরে জ্বালাতন করত বড্ড। কখন সেই কান ঝালাফালা ছুটির ঘন্টাটা বেজে উঠবে! তারপর একছুটে গেট ছেড়ে সোজা পাশের দোকান। হজমিগুলি আর স্টিকারের যে মনছোঁয়া একটা অদ্ভুত অপার্থিব স্বাদ পেতাম.... হাজার খুঁজেও এই দুনিয়ায় তার সন্ধান পাইনি আর কখনোই। তখনও এতটাই ছোট্ট ছিলাম, মুখ বাড়িয়ে দোকানের ভেতরের সাজসজ্জা কিছুই দেখতে পেতাম না বলে দুপায়ের আঙুল ভর করে উঁচু হয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে কৌতূহল মেটানোর চেষ্টা করতাম।

আর ছিল, রাস্তার বাঁদিকে আলুকাবলি - ফুচকা-টোপাকুলের সম্ভার। বহুবার সাধ জেগেছিল আলুকাবলি আর টোপাকুলের। অন্যদের তুলনায় একটু বেশিমাত্রায় হাইজিন মেইনটেইন করতাম বলে আর সাধপূরণ হয়নি। তাছাড়া মাও বলত, ওই আলুকাবলির কাঠিটা ঝাঁটার কাঠি ভেঙে ভেঙে শালপাতায় দেয়।

একবার মনে পড়ে, স্কুল ছুটির পর আর কয়েকজন ক্লাসমেটদের হিড়িকে পাশের বাড়ির অ্যাকোয়ারিয়াম দেখতে একেবারে সটান দোতলায় উঠে গিয়েছিলাম। মোহিত হয়ে রংবেরঙের মাছ দেখছি, তাদের খাবার পদ্ধতি, খেলা এইসব। নাম না জানা জলচরদের সাথে সাহিত্যিক কনভারশেসন সবেই জমে উঠেছে... এদিকে দুবার জিপকাকু খোঁজ না পেয়ে ওভারফোন খবর পাঠিয়েছে মায়ের কানে 'আপনার মেয়ে নিখোঁজ'।

সারা স্কুল, আশেপাশের বাড়ি, আরও বেশ কিছুদূর বোধ হয় জানাজানি হয়ে গেছে। এমন সময় বাড়ি থেকে আমায় খুঁজতে এসেছে স্কুলে। আমিও তৎক্ষণাৎ 'যেন কিছুই হয়নি' নিরুত্তাপ নিরুদ্বিগ্ন মনে মাছের জীবনযাত্রা নিয়ে খুটিয়ে গবেষণার পর সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাইরের ইটের রাস্তায় এসেছি... মা সারা পৃথিবী তোলপাড় করার মতো করে বুকে টেনে নিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করল। কিন্তু কখনই তার জন্য বকেনি বা মারেনি। বুঝিয়েছিল, আপনজনের দুশ্চিন্তা ঠিক কেমন হয়... 'ভালোবাসার দায় মস্ত দায়!'

এভাবেই দিনের পিঠে দিন চাপিয়ে বড়ো হয়ে গেলাম কবেই যেন! কবেকার 'সেই আমি'। স্কুলের রোজগার ছবিটা একটু একটু করে পোষাকআশাক বদলে ফেলেছে... কেমন যেন নিষ্প্রাণ 'ওরা' সবাই।

স্কুল শুরুর ঘন্টা থেকে শুরু করে বিষম নিয়মের অবাধ্য মিনিংলেস কড়াকড়ি, সাইকেল স্ট্যান্ডে সাজাবার সময় ঝনঝন শিকলের আওয়াজ, প্রিয়বন্ধু ভেবে আড়ি-ভাবের অবুঝ হৃদয়, বসার জায়গা নিয়ে কাড়াকাড়ি আর জীবনের প্রথম দুই বড় পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া পর্যন্ত একটা অগোছালো একটানা লম্বা ইতিহাস পরোপুরি মিথ্যে হয়ে গেছে।

কেবল আমি একাই রয়ে গেলাম হিজিবিজি গল্পের মতোন এই একবিংশ শতাব্দীর আড়ালে, সব 'মিহি কাচহৃদয় আর হৃদয়হীনতার মধ্যবর্তী ভাঙচুরের অগোচরে' 'আমি'টা আজও সুখেই বাঁচে। 'ওরা' এখন দু-চার আনার ঠুনকো প্রেমের কারসাজিতে বেবাক একটা জগৎ মাতায়...অধিকারের কাড়াকাড়িতে জুয়া খেলে... বাজি রাখে দাবিদাওয়ার মনভোলানো খেলায় গরমাগরম...!

আজও আমি একই রকম ব্যাগের শেষ চেইনে কোথাও কোনও আটকে থাকা এক-দু'টাকার চিহ্ন খুঁজি দু-চোখ ভরে! মাছের জীবনপ্রণালী ঘাঁটতে গিয়ে হঠাৎ কেমন নিজেকে ফাঁকি দিয়ে পাহাড়, নদী, ঝরনা, জঙ্গলের গাঢ় বন্য ঘ্রাণে উধাও হয়ে গেছি। পোড়া হৃদয়টাকে প্রকৃতির নরম আদর-উত্তাপে সেঁকতে সেঁকতে 'আজকের মৃত ছেঁড়াখোঁড়া রমেলাটের সমাধিস্তূপের বাইরে' নিজেরই একটা 'অন্য আমি'কে খুঁড়ে আনলাম.... চেনাপরিচিত আমিত্বের মুখোমুখি হলাম নিজের কাছ থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিতে গিয়ে—

"জল ছবি মুছে গেছে
ভেজা নীল আকাশের
আধো আলো বুক,
অচেনা তুলির টানে সাদা
ক্যানভাসে আঁকি
মেঘরঙা আবছায়া মুখ!"

— 'আবছায়া'